কেমন হলো এবারের বাজেট?

ভ্যানগার্ড প্রতিবেদন

প্রশ্নটা অনেকেই করছেন। অবশ্য উত্তরের জন্য খুব একটা অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। কেউ বলছেন ‘ইতিবাচক’, কেউ বলছেন ‘উচ্চাভিলাষী’ কেউবা ‘গতানুগতিক’। তবে সব পক্ষই বাজেটের বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান।

বাজেট নিয়ে আমাদের দেশের আমজনতার মধ্যে কখনোই খুব একটা উৎসাহ দেখা যায় না। তার একটা কারণ হতে পারে, বাজেটে নানা হিসাবের যে জটিল মারপ্যাঁচ তুলে ধরা হয় তা তাদের পক্ষে বোঝা একটু দুরূহ। আরেকটা কারণ হতে পারে, বাজেট আমজনতার প্রত্যাশার ধারে কাছেও যায় না। তাদের কাছে তা বরাবরই তথৈবচ থেকে যায়। এবার অবশ্য পত্র-পত্রিকায় বাজেট নিয়ে একটু বেশিই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও এ নিয়ে কিছু আলোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শীর্ষ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ভয়াবহ মন্দা চলছে। তার আঁচ বাংলাদেশের গায়েও লেগেছে। এ নিয়ে একটা উদ্বেগ সব সচেতন মানুষের মনেই আছে। আরেকটা বিষয় হল, বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুঃশাসনে অতীষ্ঠ জনগণ একটু স্বস্তির আশায় আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের দিন বদলের প্রতিশ্রুতিও অনেককে প্রভাবিত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে এবারের বাজেট নিয়ে একটু বাড়তি কৌতূহল সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

শেখ হাসিনা তার নির্বাচনী ইশতেহারকে বলেছিলেন দিন বদলের সনদ। কেউ কেউ বলছেন ওই ইশতেহারের আদলে তৈরি হয়েছে এবারের বাজেট। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, “এ সরকারের প্রথম বাজেট হবে ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সূচনা।” কতটুকু ইতিবাচক হয়েছে এবারের বাজেট? আমাদের ইচ্ছা আছে বাজেট নিয়ে খাতওয়ারি একটু বিস্তারিত আলোচনা করার। কিন্তু এ পরিসরে তা সম্ভব নয়। তাই আগামী সংখ্যা থেকে কয়েকটি ধাপে ওই আলোচনা করা হবে। আপাতত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোটা দাগে কিছু মন্তব্য করে আমাদের এ আলোচনা শেষ করব।

প্রথমেই বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু কথা। বাজেট রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের হিসাব শুধু নয়, জাতীয় আয়ের বন্টননামাও বটে। অতএব, সর্বস্তরের জনগণের মতামত নিয়েই তা প্রণীত হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে বাজেট বাস্তবে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় সবকিছু নির্ধারণ করেন কতিপয় আমলা। মতামত কিছু নেওয়া হয়, তবে তা বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, এনজিও মালিকসহ উঁচু তলার মানুষদের। ফলে বাজেটে কখনোই শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মধ্যবিত্তসহ সংখ্যাগুরু মানুষের মতের প্রতিফলন ঘটে না। এবারও বাজেট প্রণয়নের ওই সনাতন প্রক্রিয়ার কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি।

এ বারের বাজেটের মোট আয়তন এক লাখ ১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব আয় থেকে আসবে ৭৯ হাজার ৪৬১ কোটি টাকা। বাকি ৩৪ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা আসবে দেশি-বিদেশি ঋণ ও বৈদেশিক অনুদান থেকে। বাকিটা আসবে দেশি উৎস থেকে ঋণ হিসেবে। যেহেতু এ বিশাল পরিমাণ অর্থ দেশি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে, তাই বলা হয়েছে, চেষ্টা করা হবে বিদেশি উৎস থেকে যতটা বেশি ঋণ সংগ্রহ করা যায়। নানা শর্তযুক্ত বিদেশি ঋণ-অনুদানের কুফল নিয়ে আগেও বহু আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা সে আলোচনায় যাব না। কিন্তু এ টাকা ছাড় করতে করতে যে পরিমাণ দৌড়ঝাঁপ করতে হয় তা মোটেও সুখকর নয়। অধিকাংশ বছরেই দেখা গেছে, প্রতিশ্রুত বিদেশি ঋণ-অনুদানের ৫০ ভাগও কথিত দাতারা ছাড় করে না। উপরন্তু, খবরে প্রকাশ, গত অর্থবছরে বিদেশি ঋণের ৩৪% ওই ঋণ পরিশোধে খরচ হয়েছে। তাছাড়া ওদের ঋণের সাথে জুড়ে দেওয়া নানা কিসিমের বিশেষজ্ঞ ও কেনা-কাটার খরচ যোগ করলে দেখা যাবে ৯০ ভাগেরও বেশি অর্থ ওদের কাছেই চলে যায়। ফলে, ওই ঘাটতি কি বাস্তবে পূরণ হবে?

শুধু তা কেন, যে ৮০ হাজার (প্রায়) কোটি টাকা রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে তা কি পুরো আদায় হবে ? প্রতি বছরই এ খাতে এক/দেড় হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকে। এ বছরও যদি তা হয় তাহলে বাস্তবে বাজেট ঘাটতি ৩৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এর মাশুলটা গুণতে হবে কাকে? নিশ্চয়ই অনুন্নয়ন খাতকে নয়। অনুন্নয়ন খাতের বেশির ভাগ খরচ হয় সামরিক-বেসামরিক আমলা বা প্রশাসনিক লোকদের বেতন-ভাতায় এবং তাদের স্বার্থে নানা ধরনের কেনা-কাটায়। প্রতিটা সংশোধিত বাজেটের অভিজ্ঞতা হল এ খাতের অংকটা মূল বাজেটের চেয়ে বেশ বেড়ে যায়। যেমন গতবছর ঘাটতি পূরণ না হওয়ায় মূল বাজেট থেকে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা ছাঁটা হয়েছিল। কিন্তু অনুন্নয়ন ব্যয় না কমে বরং দুই হাজার কোটি টাকা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে অনিবার্যভাবে কোপটা পড়েছিল উন্নয়ন খাতের ওপর। এবারও যে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার নিশ্চয়তা কী? সম্ভবত এটা ভেবেই অর্থমন্ত্রী নিজেই তার

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি সম্পর্কে বলেছেন, “এটি এতই উচ্চাভিলাষী যে ব্যর্থতার আশঙ্কা ব্যাপক।” বলা বাহুল্য এবার এডিপি ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এর ভবিষ্যত প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করছে বিদেশি ঋণ-অনুদান পাওয়ার ওপর।

মনে রাখতে হবে কথিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য কমানোর প্রায় সব কর্মসূচি এ এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অর্থাৎ গরিব মানুষদের প্রতি শেখ হাসিনার দিন বদলের প্রতিশ্রুতি অনেকটা গাছে কাঁঠাল রেখে গোঁফে তেল দেওয়ার মতো। আর এডিপি বাস্তবায়িত হলেই কি গরিব মানুষের লাভ হয় ? এডিপির ৮০ ভাগ অর্থই স্রেফ কেনা-কাটায় শেষ হয়, যার সাথে গরিব মানুষের দূরতমও কোনো সম্পর্ক নেই। একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জাতীয় আয়ে ১৯৯৫ সালে দেশের সবচেয়ে গরিব ৫% মানুষের অংশ ছিল ০.৮৮%, এখন তা ০.৭৭%। অন্যদিকে সবচেয়ে ধনী ৫% এর অংশ ’৯৫ সালের ২৩.৬২% বেড়ে এখন ২৬.৯৩ এ দাঁড়িয়েছে। এই তো গত ১২ বছরে এডিপি’র ফল।

বলা হয়েছে, এবারের বাজেটে সম্ভাব্য মন্দা মোকাবেলার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সবাই জানেন, জনজীবনে মন্দার প্রভাব ঠেকানোর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। পিআরএসপি অনুসারে, এ বছর থেকে ’১১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর দেশের শ্রমবাজারে ১৮ লাখ ১০ হাজার নতুন মুখ আসবে। এর বাইরে এখনই আরও ১৮ লাখ ৮০ হাজার মুখ কাজের অপেক্ষায় আছে। অর্থাৎ আগামী তিন অর্থবছরে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে ৭৩ লাখ ২০ হাজার। কিন্তু এবারের বাজেটে এ লক্ষ্যে সুস্পষ্ট কোনো পদক্ষেপ নেই। এডিপি’র বাগাড়ম্বর সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। আর আছে কালোটাকার মালিকদের বিনা প্রশ্নে ৬২টা খাতে বিনিয়োগের সুযোগ। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন এ সুযোগ অনৈতিক হলেও প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে আগামী তিন বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ আশার গুড়ে যে বালি পড়বে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কারণ কালোটাকা যদি দেশে থেকে থাকে তা অবশ্যই ব্যাংক বা অন্য কোনো খাতে বিনিয়োজিত আছে। ফলে তা নতুন করে বিনিয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়ত, এ টাকা বিদেশে পাচার হয়ে থাকলে ফেরত আসার কোনো কারণ নেই। অতএব, এ এক অর্থহীন আলোচনা। সংবিধান অনুসারে সরকারের উচিত ছিল কালোটাকা উদ্ধারে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা। কিন্তু কালোটাকার মালিকদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

বাজেটে বিনিয়োগ বাড়ানোর নামে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি বা পিপিপি’র কথা বলা হয়েছে। এটা যে বাস্তবে সরকারি অর্থ তসরূপ বা জনগণের পকেট কাটার একটা ব্যবস্থা হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্যাসক্ষেত্রে কার্যকর পিএসসি’র কথা বলা যায়। এটাও এক ধরনের পিপিপি। দেখা গেছে, একটা গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন খরচ সংশ্লিষ্ট বিদেশি কোম্পানি কর্তৃক এমনভাবে ধরা হয়, গ্যাস শেষ হলেও ওই খরচ শেষ হয় না। পরিণামে সেখানে বাংলাদেশের হিস্যাও আর বাড়ে না, বাংলাদেশকে নিজের গ্যাস বিপুল দামে কিনতে হয়।

তবে পিপিপি’র সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হল, এই পিপিপি’র নামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাবার পানি সরবরাহের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়ন দেশি-বিদেশি লুটেরাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে, এসব খাতে বেসরকারিকরণ কীভাবে বাণিজ্যিককরণের জোয়ার তৈরি করেছে এবং তার ফলে এসব সেবা থেকে গরিব মানুষদের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টা আমরা দেখছি। পিপিপি কি তাদের এ অবস্থাকে আরও শোচনীয় পর্যায়ে ঠেলে দেবে না?

দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, বিশেষত গ্যাস সংকট জনগণের ভোগান্তিকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বাজেট এ ব্যাপারে কোনো আশার আলো দেখাতে পারেনি। ভীষণ লাভজনক, প্রকারান্তরে লুটপাটের, এ খাতগুলোতে পিপিপি অনেক আগেই ঢুকে পড়েছে। এবার সম্ভবত জাঁকিয়ে বসবে। জ্বালানি খাতের উন্নয়ন ও তার ওপর জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বাপেক্স-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থমন্ত্রী এ নিয়ে কিছুই বলেন নি। শুধু বলেছেন, অনশোর ও অফশোর গ্যাস অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কয়লানীতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। থলের বেড়ালটা তিনি দেখাতে চাননি। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সামান্য (৩.৮%) বরাদ্দ দিয়ে বলেছেন, “ভয় পাবেন না, পিপিপি-তে ব্যাপক বিনিয়োগ হবে।”

কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পে বিনিয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে সরকারের ভুলনীতির কারণে শিল্পের বিকাশ খুব একটা হয়নি। আর মন্দার কারণে সে-সুযোগ আরো সীমিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কৃষিই হল একমাত্র ভরসা। এখনও দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৮ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত। জিডিপিতেও কৃষির অবদান সর্বোচ্চ – ২২%। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বমন্দার ঢেউ বাংলাদেশকে এখনও যে বিপর্যস্ত করতে পারেনি, তার কারণ হল প্রবাসী আয় ও কৃষি। কিন্তু এ খাতে কখনোই সরকারের তরফ থেকে পরিকল্পিত কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। কৃষিতে এবারও বরাদ্দ ৫% এর নিচে, মাত্র ৪.৫%। টাকার অংকে তা গতবারের চেয়ে কমে গেছে। গতবার কৃষিতে বরাদ্দ ছিল ৬১০০ কোটি টাকা, এবার দেওয়া হয়েছে ৫৯৬৫ কোটি টাকা। অথচ এবার এ খাতে বরাদ্দ অনায়াসেই অনেক বাড়ানো যেত। কারণ বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, সার ইত্যাদির দাম অর্ধেকেরও বেশি কমে যাওয়ায় এসব খাতে ভর্তুকির অংক

কমে গেছে। যেমন, ২০০৮-'০৯ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকি ছিল ৫৭৮৫ কোটি, ২০০৯-'১০ অর্থবছরে এটা হয়েছে ৩৬০০ কোটি টাকা। আর ২০০৮-'০৯ অর্থবছরে ডিজেলে বিপুল ভর্তুকি দিতে হলেও এবার তা দেওয়া হয়নি, বরং লাভজনক মূল্যে বিক্রিত হয়েছে। শুধু এ ভর্তুকির টাকাটাই যদি বিনা সুদে কৃষকের হাতে পুঁজি হিসাবে সরবরাহ করা হয় তাহলে বিপুল সংখ্যক কৃষক এনজিও ও মহাজনী ঋণের (যার সুদ ৪০% - ১০০%) খড়ুগ থেকে বাঁচতে পারত। কিন্তু সরকার কৃষি ঋণ বাড়ানোর নামে একটা পরিহাস করেছে। গত অর্থবছর থেকে এবার এ খাতে মাত্র ৬২১ কোটি টাকা বাড়িয়েছে। বাজেটে কৃষিপণ্যে কৃষককে মূল্য সহায়তা দেওয়ার ব্যাপারেও কার্যকর কিছু বলা হয়নি।

কৃষিভিত্তিক শিল্প নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে বেশ কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এবারের বাজেটে এ ব্যাপারে কোনো সুসংবাদ নেই। সাধারণ কৃষকের মত পোলট্রি, ডেইরি ইত্যাদি খামারিদেরও পুঁজি ও মূল্য সহায়তা এবং সস্তায় উপকরণ সরবরাহ করা গেলে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ ঘটত। কিন্তু অর্থমন্ত্রী সেদিকে না গিয়ে হাস্যকরভাবে বলেছেন এ বছর ১২০০ খামারিকে প্রণোদনা দেওয়া হবে।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, দিন বদলের কথা বললেও জনগুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো নিয়ে সরকারি ভাবনা এখনও আগের মতোই আছে। আসলে এরাও তো মুক্তবাজার-নীতিরই অনুসারী। প্রবল মন্দায় আক্রান্ত হয়ে সব পুঁজিবাদী দেশ এবং বিশ্বব্যাংক-আইএমএফসহ সব সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাই নয়া উদারিকরণ কর্মসূচিতে একটু রাশ টেনে ধরেছে। মহাজোট সরকারও তাই একটু ভিন্ন স্বরে কথা বলছে, প্রবৃদ্ধির পেছনে একটু কম ছুটে কথিত সামাজিক বেষ্টনী বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু এটাকে সরকারি আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে বড় কোনো পরিবর্তন ভাবা কিছুতেই ঠিক হবে না। এটা জনগণকে প্রবোধ দেওয়ার একটা কৌশল মাত্র।

বাজেট সম্পর্কে বাসদের প্রতিক্রিয়া

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান ১২ জুন সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আগের তুলনায় বাজেটের আকৃতি বড় কিন্তু প্রকৃতি তেমন কিছু ভিন্ন নয়। বর্তমান সরকার দিন বদলের কথা বলে এবারেও সংবিধানের লঙ্ঘন ও নৈতিকতার স্খলন ঘটিয়ে বাজেটে কালোটাকা (চুরি এবং লুটপাটের টাকা) সাদা করার প্রস্তাব করেছে। বাজেট বরাদ্দ অনেক বেশী, কর আদায়ের পরিধিও বড়। কিন্তু এই বড় মাপের ব্যয় মুষ্টিমেয়কে স্ফীত না করে, দরিদ্রকে খয়রাতির আওতায় না এনে কর্মসংস্থান ও সেবা সম্প্রসারণ কিভাবে করবে তার আশ্বাস বাণী ছাড়া সুনির্দিষ্ট কিছু পাওয়া যায়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়, ঋণের সুদ যোগাতে সর্বোচ্চ ব্যয় হবে কিন্তু অতীত দিনের ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা বিষয়ে আলোচনা যেমন হয়নি, তেমনি বর্তমান সময়ের ঋণের জনস্বার্থের যৌক্তিকতাও প্রতিফলিত হয়নি। স্থানীয় সরকার ও পল্লীউন্নয়ন খাতে বরাদ্দ কতটা পল্লীবাসী সাধারণ জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নিরাপদ পানীয় জলসহ উন্নয়ন ও সেবা সম্প্রসারণ করবে তা আগের মতোই অনির্দিষ্ট রয়ে গেছে। এই খাতের বরাদ্দ বরাবর সরকারি দলের কর্মী-সমর্থকদের সেবা খাত হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। এবার তার ব্যতিক্রম কিভাবে হবে তা লক্ষ করা যায়নি।

কৃষিখাতে ৪.৫% ব্যয় এবং শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস ব্যয় ০.৭% থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় সরকারের এই খাতে মনযোগ কোন মাত্রায় রয়েছে। শিল্প-কৃষির মতো উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হলে অনুৎপাদন খাতের ব্যয় অনেক কমানো সম্ভব হয়। অথচ এবারের বাজেটে হয়েছে তার উল্টো। প্রতিরক্ষা খাতে ৪১০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধির যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ছিল না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, খাতওয়ারী আলোচনার চেয়েও বড় কথা হলো বাজেট প্রণয়নের আমলাতান্ত্রিক প্রথার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ থেকে সমস্যা সংকটের চাল-চিত্র এবং চাহিদা-প্রয়োজনের বিষয়টি উঠে এসে পার্লামেন্টে জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া বাজেট প্রণয়নে অনুপস্থিত। ফলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং গণউদ্যোগ সবকিছুই সাবেকি চালে চলতে থাকবে। তাই এবারের বাজেটও জনগণের না হয়ে শাসক-দলের বাজেট হিসাবেই পরিগণিত হবে।